চর্যাপদ ও আদি বাঙালির জীবনযাত্রা

শিবপ্রসাদ নিয়োগী

''বর্তমানের প্রয়োজনে অতীতকে সবসময়ই বদলে নেওয়া হয়; কোনও বৃত্তান্ত সম্পর্কেই আমরা এ কথা বলতে পারি না যে অবশেষে এই হল আসল সত্য। বড় জোর বলা যায়, কাহিনীটা এখন আমাদের কাছে এরকম মনে হচ্ছে।''

[জোসেফ ফ্রিম্যান -এর উপন্যাস ''নেভার কল রিট্রিট'' অবলম্বনে ডেলিয়েল অ্যারন ও রবার্ট বেন্ডিনার সম্পাদিত ''দি স্ট্রেনুয়াস ডিকেড'' বইটির ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।]

রাজারাজড়াদের প্রশস্তি, শিলালিপি, মুদ্রা, দলিল - পাট্টা থেকে অথবা রাজা পোষিত সাহিত্যিকদের রচনা থেকে যে ইতিহাস নির্মাণ করা হয় তা সামাজিক চেতনা ও সমাজ সংগঠনে বিবর্তন — কিছুই বোঝা যায় না তা থেকে। সুতরাং সমাজের আসল ইতিহাসের উপাদান হল লোক - সাহিত্য, প্রাচীন প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান, গল্প কথা প্রভৃতি। এদিকেই আমাদের মনোযোগ বর্তমানে আকর্ষিত হয়েছে— যা একটা সামগ্রিক ইতিহাস নির্মাণের প্রেরণা দিচ্ছে। উপাদানের অভাবে এই বর্ণালীর মধ্যে কালো ছোপ মাঝে মধ্যেই পড়ছে। দুপাশের আলোকিত অংশ থেকে ঐ কালো (অজানা) পর্যায়টি আমাদের যথাসাধ্য নির্মাণ করতে নিতে হচ্ছে— এবং ইতিহাস নির্মাণকারীদের সে বিষয়ে সচেতন থাকা এবং নিজেদের রচনায় তা পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া উচিত।

বঙ্গভূমি বলতে যে ভূখন্ডকে এখন আমরা বুঝি সেই অংশের জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস ভারতের অন্য অংশ থেকে, বিশেষত উত্তর ভারতের মূল এলাকা থেকে, অনেকটাই অন্যরকম। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে দ্বাদশ শতক (মুসলমান শাসনকালে পূর্ববর্তী) পর্যন্ত বাংলার জনজীবনের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে আর্যধর্মগুলো অর্থাৎ বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্মের ধ্যানধারণা ও জীবনচর্যার সঙ্গে কৃষিনির্ভর আদিবাসী (অস্ট্রিক' গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সংঘাত, সংমিশ্রণ এবং উভয়েরই বিবর্তনের ইতিহাস। কিছু ইতিহাস নির্মাতা মনে করেন আর্যরা (নর্ডিক) উত্তর পশ্চিম ভারতে ঢোকার আগেই, আর্যদেরই অন্য একটি গোষ্ঠী (আলপীয়) সমুদ্রপথে বাংলা অঞ্চলে চলে আসে। তাঁদের মতে বাংলার আদি সংস্কৃতি, আদিবাসী + প্রাক - দ্রাবিড় + আলপীয় (আর্য) সংস্কৃতি। নর্ডিক আর্যরা উত্তর ও উত্তর পশ্চিম - ভারতে (আর্যাবর্তে) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর তারা আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। মহাভারত ও অন্যান্য আর্যগ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে যে সেই অগ্রগতি মিথিলার পূর্বদিকে আর এগোয় নি। বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃতি বা ধর্ম তাদের প্রতিহত করে দেয়। সংস্কৃত সাহিত্যে তাই এই এলাকার প্রায় উল্লেখই নেই অথবা বর্বর, 'বাত্য' -দের আবাসস্থল বলে ধিকৃত হয়েছে। এই এলাকায় প্রচলিত ভাষাকে ''আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'' — গ্রন্থে বলা হয়েছে অসুরদের ভাষা (অসুরনাম্ ভবেৎ বাচ গৌড্রপুন্ড্রোদ্ভবা সদা।) আর্যাবর্তের লোকেরা বাংলায় গেলে তারা ''পুনোষ্টম' যজ্ঞ করে শুদ্ধ হতো। জৈন আজীবিক অথবা বৌদ্ধধর্মেরও পথ সুগম হয়নি। মহাবীর সহ জৈন প্রচারকগণ এ এলাকায় ধর্মপ্রচার করতে এসে ''আখাদ্য - কুখাদ্য'' খেতে বাধ্য হন। পরবর্ত্তীকালে চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং (বহুল প্রচলিত উচ্চারণ' বাংলায় যথেষ্ট হোস্টাইল ব্যবহার পেয়েছেন বলে লিখে গেছেন। তাঁর পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হত।

জানা যায় মৌর্য্যযুগেই ব্রাহ্মণরা বাংলায় আসতে শুরু করেন। তবে গুপ্ত যুগেই ব্যাপকসংখ্যায় আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণরা এখানে অনুপ্রবেশ ঘটান।

প্রাচীনকালে পুন্ড্রবর্ধন সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে জৈন ও আজীবিক ধর্মের কিছুটা প্রসার লাভ ঘটেছিল। তা পাল যুগের আগেই প্রায় শেষ হয়ে যায়।

বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম বরং দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর জন্য অবশ্য সেই দুই প্রধান আর্যধর্মকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। সত্যিকথা বলতে কি এ যেন, ''ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল'' গোছের ব্যাপার ঘটেছে। তান্ত্রিকতা, যাদু, লোকাচার, ব্রত সব মিশে বৌদ্ধধর্ম অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে চেহারা বাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল তা একেবারেই অন্যরকম কিছু। ৬৩৯ সাল নাগাদ হিউ এন সাং সমতট, তাম্রলিপ্ত, পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, কজঙ্গল প্রভৃতি জনপদে বহু বৌদ্ধ সংঘারাম দেখেছিলেন। বৌদ্ধ মহাস্থবিররা সেখানে অবস্থান করতেন। টাকা পয়সা আসত রাজকোষ থেকে। বিদেশি ছাত্ররা আসতেন পাঠ নিতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সব সংঘারামগুলোর অবস্থান সেই সময়কার প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় নগর অঞ্চলে। বাংলার আপামর জনজীবনে ঐসব সংঘারামের কতটা প্রভাব ছিল তা সন্দেহের বিষয়। কারণ তাহলে রাজার অতিথি বৌদ্ধ পরিব্রাজকের পথ চলতে এত হেনস্থা হতে হতো না।

।। দুই।।

এবার আমাদের ভেবে দেখতে কী সেই ধর্ম এই এলাকায় প্রচলিত ছিল যা সব অর্থেই পরিপুষ্ঠ আর্যধর্ম ও জীবনচর্যাকে হাজার বছর ঠেলে সরিয়ে রেখে দিল অথবা আর্যধর্ম ও সংস্কৃতিকে অনেক রফা করে, নিজেকে রূপান্তরিত করে, আশ্রয় নিতে হল বাংলার জনমনে। না, সেই ধর্মের কোনও নাম তো নেই। বাংলার এই সবুজ করুণ ডাঙা, এই নদী - গাঙ, এই কৃষিক্ষেত্রে - বনজঙ্গল, এই স্নিগ্ধ জলবায়ু, এখানকার আধিবাসীদের দিয়েছিল এক ধর্ম - যা এই পৃথিবীর নাড়ির স্পন্দন শোনার অবকাশ দেয়। গাছ, পশুপাখি, পাথর, পাহাড়কে পূজা করতে শেখায়। যৌন আনন্দ মুখরিত সৃষ্টির রহস্যে আবেশিত করে তার মন। বাংলার মানুষ তাই মহাভারতে ব্রাত্য। প্রবল পরাক্রান্ত যোদ্ধা রাজাদের সঙ্গে বাংলার কোনও রাজা বা বীরকে দেখা যায় না কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রাঙ্গণে। এখানে তেমন কোনও বড় রাজা নেই, বীর নেই। এখানকার মানুষ তখন ''ডিঙা বায়, রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে।'' সুতরাং একে আর ধর্ম বলবো না, এ তার চেয়েও আরও গভীর এ হল জীবনবোধ আর সেই বোধের সংগে সংগতিপূর্ণ এক জীবনচর্যা। আজ এই ২০০৭ সালেও ঐ দূর-জীবনের স্মৃতিকে আমরা বহন করি অজান্তে, আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে— পূজা ও পার্বণে। এখনও বাংলার গ্রামে একটু নির্জনে পূজিত হয় কোনও লোকায়ত দেবতা। তার 'থান' কোনও বট বা অশ্বস্থ গাছের নিচে। বেদির ওপর তেল সিঁদুর মাখানো এক পাথর। -মনে পড়ে না কি হাজার হাজার বছর আগে বসবাসকারী কৃষিজীবী আদিবাসী জীবনের কথা?

বাংলার ইতিহাস নির্মাণকারী ও বাংলাভাষার ইতিহাস গবেষক বিদ্দজ্জনেরা আদি বাংলার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে গেছেন। সেগুলো একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে—

ক। প্রধান খাদ্য ভাত। মাংস অপেক্ষা মাছের প্রচলন বেশি। শাক - সব্জি, পায়েস ও দুধ থেকে তৈরি মিষ্টান্নর আদর। ডালের প্রচলন নেই। গৌড়ীয় অঞ্চলে মদ্যপান বহু প্রচলিত।

খ। কৃষিকাজ ও ফসল উৎপাদনের জন্য পূজা ও ব্রত। নবান্ন বাংলার আদি উৎসব। মেয়েলি 'ব্রত'গুলো সবই প্রায় প্রজনন শক্তির বন্দনা।

গ। লিঙ্গপূজা, শিব (অনার্য দেবতা) ও মাতৃদেবীর পূজা।

ঘ। বৃক্ষ, পাথর, ধ্বজা পূজা।

ঙ। আলপনা ও উলুধ্বনি করা (শুভ অনুষ্ঠানে)।

চ। সমাজজীবনে ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার দাপট (বাণমারা, মারণ উচাটন, বন্ধন ইত্যাদি)।

ছ। নানা লোক উৎসবে - গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। চড়ক, গাজন, ধর্মঠাকুর, হোলি এবং এলাকাভিত্তিক মনসা ও জাঙ্গুলী দেবীর পুজো ও সমাবেশ (মেলা)

জ। শ্রীহরপ্রসাদে শাস্ত্রীর মত অনুযায়ী হাতিপালন, রেশমবয়ন, প্রেক্ষালয় (রঙ্গালয়, নৌকো বা জাহাজ নির্মাণ, আদি বাঙালির অবদান।

প্রকৃতির সঙ্গে সমতাস্থাপনকারী, প্রকৃতি পূজারক যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আমাদের আদি জনক - জননী তাঁদের জীবনচর্যার সঙ্গে আমেরিকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তুলনা করা যায়। শ্বেতাঙ্গ ইওরোপীয়ানদের সীমাহীন বর্বরতায় আমেরিকান অ্যাবরিজিনস্-রা মুছে গেছেন। বাংলার ভাগ্যে তা ঘটেনি। এখানে ঘটেছে সংমিশ্রণ ও বিবর্তন। জেনোসাইড ঘটেনি। আর্যধর্ম এবং বর্বরতা দেখায়নি— তাই নানান বর্ণের রঙধনুর মত আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি ও জীবনধারণ।

।। তিন।।

চর্যাপদ রচিত হওয়ায় সময়কালে আসার আগে, বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপট খুব সংক্ষেপে আমরা দেখে নেবো। গুপ্তযুগের শেষে বাংলা ভূখন্ডের বেশির ভাগ অঞ্চলই দুটি শাসকগোষ্ঠীর রাজত্বে ভাগ হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এলাকা সমতট রাজ্যে এবং বাংলার উত্তর ও পশ্চিম অংশ এবং গৌড়, শশাঙ্কের রাজ্যের মধ্যে ঢুকে যায়। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব - ব্রহ্মণ্য নৃপতি। ৬০৬ থেকে ৬৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁর শাসন কাল। হি এন সাং এর বিবিরণ অনুযায়ী তিনি বৌদ্ধধর্মের ওপর আক্রমণ করেছিলেন। গয়ার বোধিবৃক্ষ কেটে পোড়ানোর মত অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু এটা ঠিক যে তিনি যতই বৌদ্ধ - বিদ্বেষী হয়ে থাকুন না কেন, বৌদ্ধধর্মের মূল উচ্ছেদ তিনি করতে পারেন নি। কারণ তাঁর মৃত্যুর কিছু সময় পরেই বাংলায় এসে হিউ এন সাং তাহলে এত বৌদ্ধ সংঘারাম দেখতে পেতেন না। শশাঙ্কের ঠিক বিপরীত কাজ করেছেন সমতটের রাজা শ্রীধারণ। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁর রাজত্বের মধ্যেই সমতটে ছিলো অনেক বৌদ্ধ বিহার। জানা যায় শ্রীধারণ এজন্য বৌদ্ধদের ভূমিদান করেছেন। শশাঙ্ক পরবর্তী একশ বছর বাংলার ডামাডোলের সময়। ৭৫০ সালে গোপাল বাংলার রাজা নির্বাচিত হওয়ার সময় থেকে পালযুগ শুরু হল। বাংলার সমাজ - সংস্কৃতি জীবনে এই সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগে যে সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণের কথা বলা বলা হয়েছিল —পালযুগ এই সংমিশ্রণ ও সমন্বয়কে একটা রূপ দিয়েছিল।

এই সময়েই প্রধান দুই আর্যধর্ম — ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ — বাংলার নামহীন অথচ গভীর কৌম ও প্রাকৃত সংস্কৃতির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে মূল ধরন পালটে ফেলতে থাকে। বিমূর্ত দার্শনিক তত্ত্ব প্রবাহ হারিয়ে দৈনন্দিনের পূজা, ব্রত, পার্বণের ধরাছোঁয়া গন্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়ে যায়। আর্য দেবতারা হয়ে ওঠেন লৌকিক দেবতা। ''বিষ্ণু এখন আর ভাগবদ্ধর্মের বাসুদেব নহেন, এখন তিনি কৃষ্ণ, এবং শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, জনার্দন, হরি, মুরারি প্রভৃতি তাঁহার নাম। এইসব নামের প্রত্যেকটির সঙ্গেই কাব্য ও পুরাণ কাহিনী জড়িত।'৪ (বাঙ্গালীর ইতিহাস - আদিপর্ব। নীহাররঞ্জন রায়)। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব পালযুগে নির্মিত কষ্টিপাথরের মূর্তিগুলো বহন করে। সারা বাংলায় বিশেষত উত্তর বাংলায় ছড়িয়ে আছে অজস্র বিষ্ণুমূর্তি। বিষ্ণু ও তাঁর পরিবার। যে কেউ লক্ষ্য করলে দেখবেন পালযুগে নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। বিষ্ণু বা নারায়ণ মূর্তির গড়ন ও ভঙ্গিমার কী দারুন সাদৃশ্য। নিরীশ্বরবাদী, তথাগত বুদ্ধও আকার ধারণ করে হয়েছেন পাথরের মূর্ত্তি। তা তিনি অবলোকিতেশ্বর হোন বা ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট তথাগতই হোন না কেন। আর এই সব বিগ্রহের একই সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটেছে। পরম সমাদরে তেল সিঁদুর বা ধান দূর্বায় বাংলার নরনারীর দ্বারা পূজো পাওয়া। তাঁদের ঘিরে মেলা বা নাচগান বা ব্রত উৎসব। কোথায় সেই বোধি বা নির্বাণের আলোকপথের চর্চা, কোথায় সেই একমেবাদ্বিতীয়ম পরমব্রহ্মের স্বরূপ বোঝার সাধন! বাংলার সহজমাটিতে, সরল মানুষগুলোর হৃদয়ের ভক্তি আর ভালবাসার স্রোতে সেই মহান চিন্তাধারা থৈ পেল না একেবারে।

।। চার।।

হিউ এন সাং-এর সময়ে বৌদ্ধ সংঘারামগুলোতে থাকতেন মহাযানপন্থীরা । যাঁরা বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম ও দার্শনিকতা ধারণ ও চর্চা করতেন। পালযুগে মহাযান-পন্থীরা আর সেই বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারেনি। এর ঠিক কী কারণ বোঝা না গেলেও এটা বুঝতে পারা যায় যে সংঘারামের বাইরে যে বিস্তৃত সমাজজীবন তার সঙ্গে পরবর্ত্তী দু'শ বছরে এদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে যথেষ্ট। ইতিহাসবিদরা মোটামুটি সহমত যে দশম শতক থেকেই মহাযানপন্থীদের ধর্মচর্চায় তান্ত্রিক ধ্যান ধারণার ছোঁয়া লাগে। কৌম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংস্পর্শের জন্যই ভূত - প্রেত, ডাকিনী, পিশাচ বা মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবদেবী মহাযানীদের পুজা পেতে লাগল। সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্র, গূহ্য বা গোপন সাধন পদ্ধতিও চালু হয়ে গেল। একাদশ - দ্বাদশ শতক থেকে বজ্রযানী, কালচক্রযানী ও সহজযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। কালচক্রযানী ও সহজযানীরা দেবদেবী, পূজাপাঠ, মন্ত্রতন্ত্র বিশ্বাস করতেন না। এঁরা দেহতত্ববাদী।

সহজযানীরা অন্যদের মতই হঠযোগের চর্চা করতেন। এই যোগের মাধ্যমে দেহ ও আত্মার শক্তিকে বাড়িয়ে নিয়ে মৈথুন -এর বিশেষ ব্যবহারে এরা আত্মোপলব্ধি লাভের সাধনা করতেন। এই পদ্ধতি গূহ্য বা গোপন। গুরু পরম্পরায় তা শিষ্যরা জানতে পারেন। পরবর্ত্তীকালের বাউলরা এই সহজযান - পন্থীদের উত্তরসূরী — মূল ভাবনা ও আদর্শের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। সহজযানীদের চর্চাও সমাজবহির্ভূত অবস্থায় সম্ভব নয়। আবার খোলামেলা প্রচার করাও সম্ভব নয়। আখড়া বা বিহারের ঘেরাটোপ প্রয়োজন। আর প্রয়োজন সাঁটে বা ইঙ্গিতে এর প্রচার ও ব্যাখ্যা — যাতে মানুষ আকৃষ্ট হয় এই ভাবাদর্শে। আমার ধারণা, ব্রাহ্মণ্যশ্রেমীর ভয়ে চর্যাপদের সাংকেতিক ভাষা সৃষ্টি হয় নি। সেনযুগের আগে থেকেই তা ক্রিপটিক — কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। পরবর্ত্তীযুগের বাউলদের ভাষাতেও — ''যার আছে নিরিখ নিরুপণ, দরশন সেই পাইয়াছে।''

কৌম সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শে বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই যে শুধু তান্ত্রিকতা, লোকধর্ম মিশল তাই নয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্ষেত্রেও তাই হল। ময়নামতী অঞ্চলের নাথ বা যুগী সম্প্রদায়, অবধূত এবং কৌলমার্গীরা এই সংমিশ্রণের ফলেই উদ্ভূত। এর মধ্যে নাথ ও কৌল - দের মধ্যে মন্ত্রতন্ত্র ও যাদু প্রক্রিয়ার প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

সহজযানী বৌদ্ধরাও কালক্রমে বাংলার মূল গ্রামীণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার কারণ প্রধানত দুটো। একে তো তারা পুজা -পার্বণ, ব্রত - উৎসবের গুরুত্ব মানতেন না। অন্যদিকে বেদপাঠ, হোমযজ্ঞ এইসব আচার আচরণকেও বিদ্রূপ করতেন। সুতরাং একই সঙ্গে বৃহত্তর লোকজীবন এবং সেনারাজাদের সময়ে পুনর্জাগরিত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে প্রভাবিত, উচ্চবর্ণের সমাজের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। সেনযুগের কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা নির্যাতিত ডোম, শবর, চন্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি কৌমের মানুষ ছাড়া আর কেই তাঁদের পাশে থাকল না। এইসব সম্প্রদায়ের মানুষেরাও আবার কৃষিকাজ করত না। মূল সমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্কও বাহ্যিক। এরা অরণ্যচারী, শিকারী বা সংগ্রহজীবী।

সুতরাং চর্যাপদে বাংলার সমাজজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় —তা সম্পূর্ণ নয়, খন্ডিত। মূল সমাজের বাইরে থেকে দেখা। আবার ডোম, শবর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবযাত্রার বর্ণনা অনেক আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ।

।। পাঁচ।।

সহজযানের সিদ্ধাচার্যদের শিষ্যমন্ডলী কেউ জেলে, কেউ বা ডোম, কেউ শিকারী, কেউ পাটনী বা মাঝি। সুতরাং ধর্ম - দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব বোঝাতে তাদেরই কাজকর্মের অনুষঙ্গ এনেছেন চর্যাকারেরা। হরিণ শিকারের বর্ণনার ছলে দর্শন বোঝাচ্ছেন ভুসুকে—

তেন ন চ্ছুপই হরিণা পিবইন পানী।
হরিনা হরিণীর নিলয় ন জানী।
হরিণী বোলঅ সুন হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোতু বান্তো।।
তরংগতে হরিণার খুর ন দিসই।
ভুসুক ভণই মূঢ় হি আহি ন পইসই।।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের অনুবাদঃ-

(ভয়ে) হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল খায় না; হরিণ জানে না হরিণীর ঠিকানা। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন হরিণ এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তীব্রগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুক বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না।

এই রচনার প্রসঙ্গ বা কনটেক্সট ঠিক না বোঝায় এর মর্ম উদ্ধার যথাযথভাবে সম্ভব না হলেও, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বা সাধনপ্রণালীর কোনও নির্দেশ লুকিয়ে আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। চর্যাপদে নদীমাতৃক বাংলা— নৌকা, নৌকাযাত্রায় প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিক কারণেই। সরহপাদ বলছেন, ডান - বামে নানান খাল বিল, সেই পথে যেও না, সোজা সে পথ, সেই পথে বেয়ে যাও—

বাম দহিন জো খাল - বিখলা
সরহ ভনই বাপা উজুবাট ভইলা।।

চর্যাগানে হাতির প্রসঙ্গ, কন্যাপণ, দাবাখেলা ও ভাত রান্নার উল্লেখ আছে। এসব এমন কিছু বিরাট তথ্য নয়। বরং সমাজের উঁচুতলার মানুষের লালসার প্রসঙ্গ আর ডোমনীর সেই লালসাকে উপভোগ করার ব্যাপারটা একটু মজা করেই যেন বলেছেন কাহ্নপাদ। ডোমনী বা ঐসব সম্প্রদায়ের রমণীর যৌনতা অনেক সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন। সে সহজযানী বা কাপালিকের সাধনসঙ্গিনীও হয় আবার ওপরতলার কামুক পুরুষের সঙ্গেও ছলাকলা করতে ছাড়ে না—

কইসন হালো ডাম্বী তোহারী ভাভরী আলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী।
কেহো কেহো তোহরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোও তোরেঁ কণ্ঠ না মেলাই।।
কাহ্নে গায় তু কামচন্ডালী।
ডোম্বীতে আগলি নারি ছিনালী।।

এই গান বা কবিতায় কোনও গূঢ় তত্ত্ব কথা পাইনা — প্রিয় নারীর সঙ্গে একটু রঙ্গ রসিকতাই এর বিষয়।

চর্যাগানে বাংলা ভাষার জন্মলগ্নের একটা পরিচয় পেয়েছেন ভাষাবিদেরা। কিন্তু বাংলার প্রাকৃতজনের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে একে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এতটা বোধহয় প্রাপ্য নয়। আসলে আদিযুগের প্রাকৃতজনের ইতিহাসের উপাদান এত কম যে চর্যাপদকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বলে মনে হয়। এতে নাগরিক জীবন তো নয়ই, গ্রামীণ জীবনেরও সামগ্রিক কোনও ছবিই ধরা পড়ে নি। বাংলার কৃষিনির্ভর গ্রামজীবন বা তাঁতি, কুমোর, কামার প্রভৃতি (কারিগর) সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার কোনও ছবিই পাওয়া যায় না। অথচ বাংলার গুড়, (গৌড়বঙ্গ), গুড় থেকে প্রস্তুত মদ, বস্ত্র, নারকেল - সুপারি ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য সারাভারতে এমনকি বিদেশেও সমাদৃত ছিল। বাংলার লোক সংস্কৃতিতে যে সমাবেশ বা মেলামেশার প্রচলন ছিল তা একটি সুখী ও সম্পন্ন গ্রামজীবনকেই চিহ্নিত করে। চর্যাগীতিতে ''হাঁড়িতে ভাত নাহি নিত আবেশী''—এই লাইনাটির উল্লেখ করে অনেকে বাংলার নিম্নবর্গের মানুষের চরম দারিদ্র্যের চিত্র কল্পনা করেছেন। এটাও মনে হয় একটু প্রলম্বিত বা একস্ট্রাপোলেটেড ব্যাখ্যা। সংস্থান নেই অথচ চাহিদা মেটাতে হবে— এইভাব প্রকাশ করতেই এই লাইন লেখা হয়েছে। এর থেকে সর্বব্যাপ্ত দারিদ্র্যের কোনও প্রামাণ মেলে না। বাংলার নদী - খাল - বিলের প্রচুর মাছ, গাছের ফলমূল এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ হয়ত খুব দরিদ্রকেও অনাহারে রাখত না— অনাহারটা সম্ভবত পরবর্ত্তী বিজ্ঞাননির্ভর সভ্যতার উপাদান। যা গ্রামীণ সম্পদকে লুট করে নিয়ে বেসাতি করে বিশ্বময়।

আদি বাংলার বর্ণময় জনজীবনের কিছু পরিচয় কিন্তু আমাদের জানা। চড়ক, গাজন, গম্বীরার ইতিহাস বহুপ্রাচীন। নাচ-গান ছিল সব সমাজিক তথা ধর্মীয় সমাবেশের অংশ। মদ্যপানও গৌড়িয় বাংলায় আপামর জনগণের প্রিয় বিষয়। নাচগান প্রসঙ্গে অবশ্য চর্যাগানেও একটা উল্লেখ আছে। তবে তা কোনও উৎসবের বর্ণনার জন্য নয়। সাধনপদ্ধতির বর্ণনায় ব্যবহৃত।

এক সো পদ্ম চৌষঠী পাখুড়ী।
তাঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।

চর্যাপদে যে সুর শোনা যায় তা করুণ- বিষন্ন - একাকী। বাংলার আদি গ্রামজীবনের সুর বোধহয় তেমনটা ছিল না।

সূত্র

১। হাজার বছরের পুরাণ ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
২। বাঙালীর ইতিহাস - আদিপর্ব ঃ নীহাররঞ্জন রায়
৩। Historical Geography of Ancient and early mediaeval Bengal : Amitabha Bhattacharya
৪। বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন ঃ ড. অতুল সুর
৫। Some Historical Aspects of the Inscrptions of Bengal : Benoy Chandra Sen.
৬। এই লেখকের অন্য কয়েকটি রচনা।